International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VII, August 2016, Page No. 20-29
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

প্রাচীন থেকে আধুনিক ভারতে নারী : একটি বিশ্লেষণ

টোটন হাজরা
আংশিক সময়ের অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the contemporary world of 21st century the term 'feminism` has become one of the most familiar and buzz words. The root of such word lies in the theoretical framework of gender-biased question. Women, through comprise more or less half of world population have been subjected by the gender-biased patriarchal society despite taking significant role in all sphere of human activities viz. Social, Political, Economical and Cultural life. The basic question that may be raised here: do the women possess equal status like men in society? The primary objects of this article is to explore the condition of women in Indian society with special reference to changing status of women from ancient era to contemporary Indian Society. This article is also an attempt to focus the consistant fight of women for their dignity against an omnipotence diseriminatory gender-biased society in India.

Key Words: Feminism, Gender-biased Society, Patriarchy, Dignity, Status of women.

নারীবাদ নিছক মহিলাদের স্বার্থে একটা তত্ত্ব নয়- নারীবাদ একটা জীবনবীক্ষা যা আজকের পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বহু কাল আগে থেকেই নারীকে কেন্দ্র করে এবং সমাজ নারীর স্থানকে কেন্দ্র করে বহু আলোচনা ও বিতর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতীয় সমাজের সঙ্গে নারীর অবস্থান এতটাই ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল যে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্থানের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। বর্তমান সমাজে নারীর যে অবস্থান তার থেকে প্রাচীন সমাজে নারীর স্থান অনেকটাই ভিন্ন ছিল। নারীর অবস্থানের এই পট পরিবর্তন ও পার্থক্য অবশ্যই সমাজ এবং পরিস্থিতির ভিত্তিতেই মূলতঃ সম্ভবপর হয়েছে। তাই নারীবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যের দাবী রাখে, ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান বিষয়ক আলোচনা। তাই এই প্রবন্ধে প্রাচীন সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজে নারীর স্থান এবং নারী কেন্দ্রিক আলোচনা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক এবং নারীবাদী মতামতের উপর আলোকপাত করাই হল মূল উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে প্রকৃত নারীর সংজ্ঞা হলো 'সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপরে কথা বলে না'। এমনটাই রয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩/২৪/২৭)-এ। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সমাজেও নারীর অবস্থান সর্বনিম্নে। হিন্দু শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী তৎকালীন যুগ থেকেই ভারতীয় আর্থসামাজিক কাঠামোতে সর্বত্র সাধারণভাবে নারীকে শূদ্রের এবং পশুর সঙ্গে একাসনে বসানো হয়েছে। বৈদিক যুগেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা মনুও নারীকে 'মিথ্যার মত অপবিত্র' আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য বৈদিক যুগে কিছুটা হলেও নারীর অবস্থান ভালো ছিল। বৈদিক যুগে যে সমস্ত যাগ যজ্ঞ করা হত সেখানে নারীরা স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করত। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ, আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতির যে চিত্র ঋগ্বেদে পাওয়া যায় তার থেকে

এটা স্পষ্ট হয় যে সেই সময়ে স্ত্রীজাতি বিশেষ সম্মানের অধিকারীনি ছিল। স্ত্রীরা যে স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন তা বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- 'হে ইন্দ্র তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পত্তি তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণ হব্য দান করে তোমার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করেছে।' [১/১৩১/৩] 'পরিণীত দম্পতি একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্য দান করেছে।' [৫/৪৩/১৫] শুধুমাত্র একত্রে যজ্ঞ করার অধিকার নয়, কিছু নারী ঋষির সমর্যাদা পেত। যেমন- 'পঞ্চম মন্ডলের আঠাশ সূক্তের রচয়িতা বিশ্ববারা নামে রমনী, এই সঙ্গে অত্রির দুহিতা অপলা [৮/৯১/১] এবং ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রানীর [১৪/১৪৫/১৬] নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।'[১]

অন্যদিকে আমরা এমন কিছু দৃষ্টান্ত দিতে পারি যেখানে নারী বঞ্চনার চিত্র পরিস্ফুট হয়। ঋকবেদের ঋষি অম্ভৃণ-এর কন্যা সত্যদ্রষ্টা **ঋষিকা বাক্** ভারতীয় তত্ত্ব দর্শনের ইতিহাসে 'সোহয়ম' মহাকাব্যটি প্রথম ঘোষণা করলে পুরুষশাসিত সমাজে **ঋষিকা বাক্** -এর নামটির পরিবর্তে ঐ মহাকাব্যটির সঙ্গে বেদান্তদর্শনের রচয়িতাকে যুক্ত করা হয়।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসু পত্নী গার্গী ঐ ঋষিকে গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সত্যদ্রষ্টা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে নিবৃত্ত হতে বলেন এবং আরও বলেন - এসব তত্ত্বজিজ্ঞাসার নারীর কোনো অধিকার নেই। শুধু তাই নয় তিনি বলেন যদি গার্গী তার প্রশ্নবান থেকে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাঁর অধিকারের সীমা লঙ্ঘনের অপরাধে গার্গীর মুন্ডচ্ছেদ করা হবে।

বৈদিক যুগে যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদিতে দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে ধেনু (গাভী) দান করা যেমন রীতি ছিল তেমনি সুন্দরী যুবতী দানও প্রচলিত ছিল - অর্থাৎ ধেনুর মতো যুবতী ছিল পণ্যসামগ্রী।

পরবর্তীকালে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বরাহ-মিহিরের পুত্রবধূ ক্ষণা জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রে অভুতপূর্ব পান্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। সেই পান্ডিত্যের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সম্রাট বিক্রমাদিত্য ক্ষণাকে তাঁর নবরত্ন সভাকে দশমরত্নরূপে অলঙ্কৃত করার অনুরোধ জানালে বরাহ-মিহির ক্ষণার জিহ্বা ছেদন করেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে পাশ্চাত্যের দাস প্রথার বর্বরতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের কোন পার্থক্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র তাই নয় ধর্মীয় অনুশাসনের নিরিখে তৎকালীন সামাজিক আইনগুলি বা আচার-আচরণ গুলি প্রধানত উচ্চবর্ণের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। সেই সময়ে নারী মাত্রই ছিল শূদ্রতুল্য, তা উচ্চবর্ণের নারী হলেও ব্যতিক্রম ছিল না। সব বর্ণের নারীকে এইভাবে সমাজের নিম্ন স্তরে নিয়ে এসে শোষিত, নির্যাতিত এবং বঞ্চিত করে রাখার দায়িত্বটা ধর্ম শাস্ত্রগুলি যথাযথ ভাবে পালন করেছিল। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ -

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য - এই তিন বর্ণ উপনয়ন সংস্কারের পর দ্বিজ নামে অভিহিত হতো। কিন্তু শূদ্রের উপনয়নের অধিকার ছিল না। অনুরূপভাবে বৈদিক যুগের প্রথমভাগে নারীর উপনয়ন সংস্কারের অধিকার থাকলেও পরবর্তীকালে তা নিষিদ্ধ হয়; (খ) প্রাচীন ভারতে পাঠ ও শিক্ষা বলতে বেদপাঠ ও বেদ শিক্ষাই বোঝাতো। কিন্তু মনুর বিধান অনুযায়ী বেদপাঠ করা, এমনকি বেদপাঠ শোভনেও শূদ্রের নিষিদ্ধ ছিল। নারীদের সম্বন্ধেও মনু বলেছে যে, নারীর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ (বেদ) পাঠের কোন অধিকার নেই।[২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শূদ্র এবং নারী উভয়ের পক্ষেই বেদপাঠ নিষিদ্ধ করে তাদের সামাজিক অমর্যাদার পথটি প্রশস্ত করা হয়; (গ) বেদপাঠ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে একই সঙ্গে শূদ্র এবং নারীর জন্য যাগযজ্ঞ ভিত্তিক সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ হয়। যজ্ঞভিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান এখনও সংরক্ষিত আছে উচ্চবর্ণের পুরুষদের জন্য, বিশেষত ব্রাহ্মণের জন্য নির্ধারিত এবং এখনও আছে, কিছু কিছু নিম্নস্তরের পূজা ও ব্রত শূদ্র ও সব বর্ণের নারীকে শাসন, শোষণ ও অবহেলার মধ্যে রাখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল

বৈদিক ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে তাদের দূরে রাখা; (ঘ) শূদ্র এবং নারীকে দাসত্বের মধ্যে রাখার সর্বপ্রধান উপায়টি ছিল এদের উভয়কেই আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব করে দরিদ্র শ্রেণিতে পরিণত করে রাখা।

প্রাচীন ভারতে শূদ্ররাই ছিল দাস বা সেবক শ্রেণিভূক্ত। আরও বলা যায় যে এখানে শূদ্রের মতো সকল বর্ণের নারীকেও স্বামীরূপী প্রভুর অধীনস্থ করে তাকে নিজস্ব ধন সঞ্চয়ের (নিজস্ব ধন থাকলেও) অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেদিন থেকে শূদ্র ও নারী একই দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্গত। বর্তমান নারীর সম্পত্তির আইনি অধিকারের অনেকখানি উন্নতি ঘটলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্ত্রী এখনও স্বামীর পরিবারের দাসীর মতো শুধু ভরণীয়া। স্বামীর জীবিতাবস্থায় স্বামীর ধনসম্পত্তিতে এখনও স্ত্রীর কোনো অধিকার থাকে না। সাধারণ নারীর জীবন নির্দিষ্ট আছে বিবাহ, সন্তান-পালন এবং স্বামী পুত্র ও বৃহৎ পরিবারের পরিজনদের সেবার জন্য। শূদ্রের যেমন একমাত্র কাজ ছিল উচ্চবর্ণের সেবা করা, সকল বর্ণের নারীরও তেমনি কাজ ছিল পরিবারস্থ সকলের সেবা করা। আর যে সমাজের উচ্চবর্ণের নারীরাও শূদ্রের সাথে তুলনীয় ছিল, সেখানে দরিদ্র অস্পৃশ্য দলিত নারীদের অবস্থা যে ছিল আরও শোচনীয় তা সহজেই অনুমান করা যায়, ঘরে এবং বাইরে এই নারীরাই ছিল সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত। পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও সনাতন সেই ধারা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

সকল বর্ণের নারীর স্থান আজও আর্থসামাজিক কাঠামোর তলদেশে। শূদ্রের মতোই সাধারণ নারী সামাজিক মর্যাদায়, শিক্ষায় এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের অনগ্রসর। মন্ডল কমিশন এর সুপারিশ অনুযায়ী সামাজিক (বর্ণভিত্তিক), অর্থনৈতিক অ শিক্ষাগতভাবে অনুন্নত গোষ্ঠীই অনুন্নত বা অনগ্রসর শ্রেণিরূপে নির্ধারিত হয়। এদিক থেকেও নারীরা অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যেই পড়ে, কারণ সামাজিক মর্যাদায়, শিক্ষায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে নারীরা (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) আজও অনগ্রসর। সমস্ত সরকারী, বেসরকারী নথিপত্রে তাই এখনও তপসিলী, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং নারীকে একসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়। অর্থাৎ নারীমাত্রই তপসিল জাতি / উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তুলনীয়।

তবে একথা বলা যায় যে, সববর্ণের নারীই সাধারণভাবে আর্থসামাজিক হীন স্থানে অবস্থিত হলেও কার্যত উচ্চবর্ণ তথা উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীর সাথে দরিদ্র তপসিলী জাতি, উপজাতি (আদিবাসী) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির নারীকে একাসনে বসানো যায় না। প্রাচীন ভারতে শূদ্র, আদিবাসী এবং অনগ্রসর নারীরা শিক্ষায়, সামাজিক মর্যাদায় এবং জীবন যাত্রায় উচ্চবর্ণের এবং উচ্চশ্রেণির নারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং পিছিয়ে পড়া জগতের বাসিন্দা ছিল। সেখানে সাধারণত উচ্চবর্ণের নিজস্ব কোনো অর্থকরী পেশা ছিল না। কিন্তু চরম পারিবারিক দারিদ্রই নিম্নবর্গের নারীকে বিভিন্ন অর্থকরী পেশায় টেনে এনেছিল। আর এসব নারীরা সামাজিক মর্যাদায় অবহেলিত এবং শিক্ষায় অতি অনগ্রসর থাকলেও দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। আজও সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানারকম অর্থকারী বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও প্রধানত দারিদ্রতার কারণেই এদের পারিবারিক জীবনেও একটি বিশেষ মাত্রা ছিল; এবং এখনও আছে। আর এসব কারণেই উচ্চবর্ণের নারীদের থেকে নিম্নবর্ণেরা অনেকখানি স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

আমরা যদি রামায়ণ মহাভারতের যুগে সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করি তাহলে দেখব যে সেখানেও নারীর অবস্থার চিত্র খুব সহজ সরল ছিল না। মহাভারতে আর্য-অনার্য নানা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছোট, বড় অনেক রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষের চিত্র দেখা যায়। সেই সময়ে সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। রামায়ণে রাজা দশরথ বহু বিবাহ করেছিলেন যদিও তার পুত্ররা কেউই একের অধিক বিবাহ করেননি। মহাভারতের এক স্ত্রীর বহু স্বামী- এইরূপ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন। রাক্ষস সমাজেও বহু বিবাহ প্রচলন ছিল। তাদের সমাজে নারীরা বেশি স্বাধীন ছিল, কারণ শূর্পনাখা রাম ও লক্ষণকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

রামায়ণে নারীর একটা বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। সেটা হল তাদের অন্তঃপুরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল। রাম যখন বনবাসে যায় তখন তাঁর স্ত্রী সীতা তার সঙ্গী হয়ে বনবাসে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় নারীর সামাজিক মর্যাদা যে সুনিশ্চিত ছিল তা বলা যায় না, কারণ সেই সময়ে নারীদের পুরুষের ভোগ্য হিসাবে ব্যবহার করা হত। সেই সময়ে নারীরা ছিল দানের উপকরণ। আবার অতিথি সেবায় নারীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হত। এছাড়াও সীতার বারবার অগ্নি পরীক্ষা একথাই প্রমাণ করে যে সেই সময়ে সমাজে নারীদের প্রতি কোনো সহানুভুতি ছিল না। তাছাড়াও রাজ পরিবারের নারীদের যদি এইরূপ পরিণতি হয়, তাহলে সাধারণ নারীদের দুর্দশা কিরূপ ছিল তা বলাই বাহুল্য।

আবার রামায়ণে এটাও দেখা যায় যে নারীরা কেবল মাত্র তাদের স্বামীর অনুগামী ছিলেন না, তারা তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতেন, কারণ রাবণের স্ত্রী মন্দোধরী স্বামীর রূপ, গুণ, শৌর্য ও চরিত্রের প্রশংসা করার সময় সীতার প্রতি মোহের জন্য রাবণকে যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। আবার রামচন্দ্রের মত একজন ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যক্তি যখন সীতাকে সন্দেহ করেছিল; সীতা এই অপমানের সমুচিত উত্তরে বলেন - লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে রক্ষা করুণ। সেই রামচন্দ্রের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে যেতে পারেননি, পাঁচমাসের গর্ভবতী স্ত্রীকে জঙ্গলে নির্বাসন দিয়ে যে রাজা তাঁর সিংহাসনকে নিরঙ্কুশ করেন, দীর্ঘ বারো বছরে যিনি একবারও পুত্রদের খোঁজ নেন না, সেই রাম আমাদের আদর্শ পুরুষ, সীতার পতিভক্তি ভারতের কালজয়ী আদর্শ।

সেই সময়ে আর একজন বঞ্চিত নারীর উল্লেখ করা যায় যিনি সবসময়ই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছেন, সেই বঞ্ছিত নারী হলেন লক্ষণের স্ত্রী ঊর্মিলা। যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে তার ভাই লক্ষণ চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গমন করলেন, তখন লক্ষণের স্ত্রী ঊর্মিলা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরেই চৌদ্ধ বছর ভগ্ন হৃদয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তার এই আত্মত্যাগের যথাযথ মর্যাদা তিনি পাননি। তিনি স্বামী সুখ বঞ্চিত হয়েও, কোনো প্রতিবাদ না করেই নিঃশব্দে চির বধূত্ব বরণ করেছিলেন।

বৈদিক যুগের ন্যায় রামায়ণ মহাভারতেও স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞে হব্য দেবার অধিকার ছিল। রামায়ণে দেখা যায় যে কৌশল্যা ছিলেন দশরথের যজ্ঞে অংশভাগিনী। আবার সীতার পাতাল প্রবেশের পর রামচন্দ্র যখন যজ্ঞ করেন, তখন স্ত্রী অংশগ্রহণকারী রূপে সীতার স্বর্ণ মূর্তি গড়েছিলেন।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে কোনো নারীবাদী আন্দোলন হয়েছিল কিনা কোনো নিদর্শন পাওয়া না গেলেও আমরা যে পুরুষতন্ত্রের কথা বলি তা তখন অব্যাহত ছিল, আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে পারি যে প্রাচীন মহাভারতের যুগে একজন নারী কিভাবে তথাকথিত পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করেন। মহাভারতে উল্লেখ্য কাশীরাজের কন্যা অম্বা এবং তার দুই বোন অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ভীষ্ম যখন স্বয়ংবর সভা থেকে হরণ করেন তখন অম্বা তার ইপ্সিত বাসনা ভীষ্মকে জানান। তিনি বলেন যে, তিনি শল্বরাজকে কামনা করেন। ভীষ্ম অবশ্য তার ইপ্সিত বাসনা পুরণের জন্য শল্বরাজের কাছে অম্বাকে পাঠান। কিন্তু অম্বা যেহেতু বিবাহের জন্য অন্য কর্তৃক গৃহিতা তাই শল্বরাজ অম্বাকে ত্যাগ করেন। অম্বা এই অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তার এইবিপর্যয়ের জন্য তিনি তার পিতাকে দায়ী করেন এবং সেই সময়ের বিবাহ প্রথার চরম বিরোধীতা করেন। তিনি যেকোনো মূল্যে তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেন। তিনি ভীষ্মের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পুরুষ হওয়ার কামনা করেন। যেভাবে তিনি প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং এটা আমরা দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে অম্বা হলেন প্রথম ভারতীয় নারী যিনি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

এইভাবে প্রাচীন ভারতের নারী নিগ্রহের ভাব ধারাটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় সমাজে চিরকাল নারী পুরুষের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং এর অবসান ঘটানোর জন্য নারীজাত আজও সরব ও সক্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেনি। যন্ত্রণা মুক্তি, সুখ সন্ধান এবং অভিলাষ অনুসারে আত্মবিকাশ যদি 'মানুষের অধিকার' বা

'মানবাধিকার' হয় তাহলে বিনাসংকোচে বলতে পারা যায় যে, ভারতীয় সমাজে নারীর অধিকার নিদারুণ ভাবে অবহেলিত। ভারতীয় নারী প্রকৃতপক্ষে পরিবারের পরিচারিকা। তার বিচরণ ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ - রান্নাঘর থেকে আঁতুড় ঘর, আবার আঁতুড় ঘর থেকে রান্নাঘর।[৩]

প্রাচীন কাল থেকেই সংসারের চাকায় আবদ্ধ ভারতীয় নারীর অবস্থা খাঁচার পাখির মতো, বদ্ধাবস্থায় যার ডানা মেলবার জায়গা থাকে না - কেবল ডানা ঝটফটানির মতো এক অসহায় মর্মবেদনাই কেবল অনুভব করে। ভারতের সমাজচিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে এই অবহেলিত নারী চিত্রটি সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সাধারণভাবে যা চোখে পড়ে, তার বিচারে, উচ্চবর্ণের বাইরে ভারতীয় নারীর অবস্থা দুর্বিষহ। এই পৃথিবীতে ভারত সত্যিই একটা ব্যতিক্রম, এদেশে জন্মের মুহূর্তে ভারতীয় নারীর প্রত্যাশিত আয়ু পুরুষের চেয়ে কম, চল্লিশ বছর বয়সের আগেই নারীর মৃত্যুর হারও বেশি থাকে।

সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কোনো আলোচনা চক্র, যথা - ব্যবসায়িক সভা সমিতিতে স্ত্রীলোকের অভিমত অপেক্ষা পুরুষের অভিমতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণভাবে পুরুষকে শক্তিমানবরূপে এবং স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত দুর্বলরূপে গণ্য করা হয় এবং মনে করা হয় যে, পুরুষের কাজ মূলত অর্থ উপার্জন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ইত্যাদি আর স্ত্রীলোকের কাজ মূলত সন্তানের পরিচর্যা ও গৃহকর্ম। পুরুষের কাছে পরিবার পরিচর্যা অপেক্ষা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ বেশি কাম্য, আর স্ত্রীলোকের কাছে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ অপেক্ষা তার পরিবার পরিচর্যা বেশি কাম্য। আবার ব্যবহৃত ভাষাতেও এই লিঙ্গ বৈষম্য পরিস্ফুট হয় - ইংরাজীতে কোনো পুরুষকে বলা হয় (Man), আর স্ত্রীলোককে বলা হয় (Women)। বাংলা ভাষায় পুরুষকে বলা হয় 'সুন্দর' স্ত্রীলোকে বলা হয় 'সুন্দরী'।

লিঙ্গ বৈষম্য প্রসঙ্গে ভারতীয় মনোভাব অত্যন্ত রক্ষণশীল, যেখানে নতুন ভাবনা চিন্তার কোনো স্থান নেই, সংস্কার সাধনের কোনো উদ্যোগ নেই। সুপ্রাচীনযুগ থেকেই ভারতীয় সমাজে নারী অবহেলিত, উপেক্ষিত ও নির্যাতিতা। কেতাবী ভাষায় নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী রূপে বিশেষিত করলেও, বিবাহের মন্ত্রে 'যদিদং হৃদয়ং মমঃ তদিদং হৃদয়ং তবঃ' উচ্চারিত হলেও বাস্তবে পুরুষ নারীকে তার ক্রীতদাসীরূপে অথবা ভোগ্যপণ্যরূপে গণ্য করেছে। পাশ্চাত্যের সমাজচিত্রের ইতিহাসেও নারী দীর্ঘকাল অবহেলিত, পুরুষের আজ্ঞাবাহী দাসী। ফরাসী বিপ্লবের আগে ও অব্যবহিত পরিবর্তীকাল গুলিতে ফ্রান্সের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বৈবাহিক সম্পর্কের আবরণে নারীদের ব্যাভিচারের মূল্যবান সামগ্রীরূপে ব্যবহার করেন। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার আগে জারের শাসনকালে রাশিয়ার নারীদের মহার্ঘ পণ্যরূপে ব্যবহার করা হত। শিল্প বিপ্লবের আগে এবং অব্যবহিত পরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতেও পুরুষ শাসিত সমাজে নারী জীবনের স্বতন্ত্র মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আজও কোনো রাষ্ট্রের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে একাধিক নারীর শ্লীলতাহানি করেও শাস্তি পান না।

আমাদের পরিবার, বিশেষত দরিদ্র পরিবারে, লিঙ্গগত বৈষম্যের বীজ বপন করা হয় ছেলে মেয়েদের শৈশবকাল থেকেই। প্রকৃতপক্ষে, দরিদ্র পরিবারে বিবাহযোগ্য অশিক্ষিত কন্যার জীবন অভিশপ্ত। শিক্ষার অভাবে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে না, কলঙ্ক জনক পণপ্রথার জন্য তাদের বিবাহ হয় না, হলেও উপযুক্ত পাত্র জোটে না। দরিদ্র পরিবারের অসহায় সম্বলহীন বিধবাদের দুর্দশা বর্ণাতীত। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করে বিধবা-বিবাহের প্রচলন ঘটালেও ভারতীয় সমাজে আজও ঐ ব্যবস্থা সমাদৃত হতে পারেনি। বাল্য বিধবাদের পিতৃগৃহে অথবা শ্বশুরালয়ে গলগ্রহরূপে জীবনযাপন করতে হয় এবং কখনো বা তাদের পরিবারের সুযোগ সন্ধানী পুরুষের কামতৃষ্ণা তৃপ্ত করতে হয়; ঐ ভ্রষ্টাচার জানাজানি হলে পুরুষটির কোনো ক্ষতি হয় না, বিধবাটি নির্যাতিত ও আশ্রয়চ্যুত হয়।

ভারতীয় সম্প্রদায় চিরকাল অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ভারতের এলিটিজিমের প্রাধান্য আজকের নয়। এর উৎস সন্ধান করতে হলে যেতে হবে ইতিহাসের পথ ধরে সুদূর অতীতে। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস নীচু শ্রেণির কথা (নারীদের কথা) আগাগোড়াই বাদ পড়ে আছে।

কূটবুদ্ধি পুরুষের নারী বন্দনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজে চিরকাল নারীর মানবাধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ চিত্র পুরুষেরই রচনা, নারীর কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই এবং আধিপত্যকামী কূটবুদ্ধি পুরুষ অভিসন্ধি মূলকভাবে নারীর এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করে তাকে নির্বাক চিত্রের মতনই গৃহবন্দী করে রেখেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঋকবেদ রচনাকাল, আনুমানিক খ্রীঃপূর্ব দ্বাদশ শতক। ঋকবেদে দেখা যায়, নারী যেমন কাব্যরচনা করেছে, তত্ত্বালোচনায় পুরুষের মতো অংশগ্রহণ করেছে, তেমনি আবার বীর্যবতীরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে শত্রুনিধনও করেছে। এই সময় বধূ-নির্বাচনের মানদন্ড ছিল পাত্রীর বুদ্ধির প্রখরতা ও জ্ঞানের গভীরতা, দেহশ্রী, সম্পদ অথবা কৌলিন্য নয়। কিন্তু নারীর এই মর্যাদা দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারেনি। খ্রীঃপূর্ব দশম শতাব্দীর পরবর্তীকাল গুলিতে অন্যান্য বেদ রচনাকালে, বিশেষত অথর্ববেদ রচনাকালে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয় এবং তারা একপ্রকার ভোগ্যপণ্যের পরিণত হয় - পুরুষের, বিশেষ করে স্বামীর ভোগের বিষয়। অথর্ববেদে নারীকে শূদ্রের সমতুল্যরূপে গণ্য করে 'সেবা'-কেই (পতি ও পরিবারের সেবা) তাদের একমাত্র কর্তব্য - কর্মরূপে নির্ধারণ করা হয়। ঋষি বাৎসায়ণ আবার তাঁর কামসূত্রে' নারীমাত্রকেই গণিকার সমতুল্যরূপে গণ্যকরে তাদের 'ভোগ্যসামগ্রী' বলেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার নারীকে 'পঙ্কময়', 'নেশার বস্তু', 'নরকের দুয়ার' ইত্যাদি বিশেষণেও বিশেষিত করা হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও নারী-পুরুষের ভেদাভেদ সুপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কেশ-বিন্যাস, বেশভূষা, চলা কথা বলা ও বসার ভঙ্গী দেখেই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজ অনুসৃত পথে কেশ বিন্যাস, বেশভূষা ও চলা-বলার ধরন দেখেই বোঝা যায় যে, সে নারী অথবা পুরুষ। সমাজ অনুমোদিত এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে কেউ অনুসরণ না করলে আমরা তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না, কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আবার কখনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়।

লিঙ্গ-বৈষম্য অনুসারে বেশ-বাসের বৈষম্যের জন্য অনেক সময় আবার আমাদের জীবনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা পুরুষের কাছে অনুকূল হলেও স্ত্রীলোকের কাছে প্রতিকূল। পোশাকের ধরণ ও চলনভঙ্গি দেখেই যেখানে নারী অথবা পুরুষ চিহ্নিত করা যায় সেখানে গভীর রাতে একাকী বাড়ি ফেরার সময় কোনো স্ত্রীলোকের পোশাক ও চলনভঙ্গি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাকে পুরুষ অপেক্ষা বেশি অসহায় ও দুর্বল জেনে দুষ্কৃতিরা স্বভাবতই আক্রমণ করে।

প্রকৃতপক্ষে, লিঙ্গ বৈষম্যের মূলে মানুষের জন্মগতি নয়, তা হল সামাজিক পরিবেশ। নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য তা স্বভাবগত নয়, তা নেহাৎই কৃত্রিম, সমাজের সৃষ্টি। নারী পুরুষের এই অহেতুক বৈষম্যের জন্য ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে নারী নির্যাতন প্রতি অঞ্চলে প্রতিদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ভারতের অনেক অঞ্চলে দরিদ্র পরিবারে কন্যাসন্তানকে শৈশবকালে তার আহার্য না দিয়ে প্রকারান্তরে হত্যা করা হয়; পুত্রসন্তান অপেক্ষা কম পরিমাণে খাদ্য দেওয়া হয়; পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও কন্যাসন্তানের জন্য তা করা হয় না। অমর্তসেনের সমীক্ষা অনুসারে কোনো অঞ্চলে ছেলেদের জন্য ভালো স্কুল না থাকলে অথবা ভালো স্কুলে লেখাপড়া ভালো না হলে সেখানকার মানুষ ভীষণভাবে প্রতিবাদী হন এবং সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিপরীত ক্রমে, মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সামাজিক রক্ষণশীলতাকে সাগ্রহে রক্ষা করতেই বাবা এবং মা তৎপর থাকে।

বাইরের পৃথিবীর চোখে ভারতবর্ষের পরিচয় বিশেষ করে তার জাতিভেদ এবং নারী নির্যাতনে। মুষ্টিমেয় বিত্তবান পরিবারের বাইরে ভারতে বিরাট সংখ্যক জনসমাজে 'নারী-স্বাধীনতা', 'নারীমুক্তি অধিকার' ইত্যাদি শব্দগুলি নেহাৎই শূন্যগর্ভ ধ্বনিমাত্র। ভারতের লক্ষ কোটি নির্যাতিত অবহেলিত নারী তার ভাগ্য-বিধাতাকে প্রশ্ন করে 'আমাকে পুরুষ না করে নারী করলে কেন'? – বিধাতা নিরুত্তর থাকে। আর ভারতীয় নারীর এই আকুল প্রার্থনা শুধু বর্তমান কালে নয়, প্রাচীন যুগ থেকেই পরিলক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষে কিছু প্রতিবাদী নারীর আবির্ভাব ঘটলেও পুরুষ-শাসিত সমাজের রক্তচক্ষুর বাইরে নারী স্বাধীনতার জন্য পৃথক নারী আন্দোলন কখনই গড়ে ওঠেনি। হয়তো মনে হতে পারে ভারতবর্ষে নারীবাদী আন্দোলন গড়ে না ওঠার পশ্চাদে মূল কারণ হল ভারতবর্ষ সর্বদাই নারীজাতিকে মর্যাদা দিয়েছে, মাতৃরূপে পূজো করেছে। তাদের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান সমাজে সুদৃঢ় ছিল।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মহিলাদের ভোটাধিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৪ জনের একটি দল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই দাবিটি তুলেছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা ও স্বামীর সম্পত্তির শর্তাধীনে মহিলাদের সীমিত ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রথম কার্যকরী হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই ভোটাধিকারে তিনটি শর্ত ছিল। যথা – '(১) নারীকে বিবাহিতা হতে হবে, (২) তাকে সম্পত্তির অধিকারিনী হতে হবে এবং (৩) তাকে শিক্ষিতা হতে হবে' উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যারা নারী-শিক্ষার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০) এবং গুজরাটের দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) প্রমুখ। তাঁদের প্রচেষ্টার এবং ভারত সরকারের Report of the Committee on the Status of Women (December 1974) থেকে জানা যায় - Only a few thousand girls, mostly belong to urban upper and middle class families, entered the formal system of education between 1850 and 1870.'[৪]

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ওলস্টনক্রাফ্ট মেয়েদের যে জাতীয় বঞ্চনার কথা উল্লেখ করেছেন সমকালীন ভারতের নারীর ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। এছাড়াও ভারতবর্ষের মহিলাদের ঔপনিবেশিকতার চাপ ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়ার জন্য সেই সময়ে মহিলাদের দাবিদাওয়া পেশ করতে হতো বিদেশী শাসকের কাছে। আর এইরূপ প্রতিবাদ অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছু নয়। ব্রিটিশ সরকার তাদের রাজত্ব বজায় রাখার স্বার্থে এদেশে কিছু ছাপাখানা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে মহিলারা অতি নগণ্য জায়গা পেয়েছিলেন।

যখন পশ্চিমের দেশগুলিতে সক্রিয়ভাবে নারী মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষে সংগঠিত নারী আন্দোলন না হলেও কোন কোন ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীকে আরো সক্ষম করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই চেষ্টার পেছনে যে মনোভাব কাজ করেছিল তা হল নারীকে সুগৃহিনী করে তোলা ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবের পরবর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে সে তার স্বামীর প্রকৃত কর্মসঙ্গিনী হতে পারে।

ভারতবর্ষে একটা সময় ছিল যে সময় নারী ও পুরুষ উভয়ের সমবেতভাবে লড়াই করেছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, তাদের লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা। এর ফলে নারীর শৃঙ্খল কিছু শিথিল হয়েছিল। কিন্তু নারীর নিজস্ব সমস্যা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে দীর্ঘ মেয়াদী কোন আন্দোলন এখনও গড়ে ওঠেনি। সেই সময়ে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে নারীরা কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। ভারতবর্ষে নারীদের একই সঙ্গে দুপ্রকার চাপের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। একটি হল ঔপনিবেশিকতার এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের চাপ। সেই সময়ে

বেশি করে প্রথম চাপটি অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতার চাপটি জরুরি মনে হয়েছে অথবা এটা ভাবা হয়েছে যে ঔপনিবেশকতার হাত থেকে মুক্তি পেলে লিঙ্গ-বৈষম্যের অবদমন আর থাকবে না।

আমাদের মনে ছোট থেকেই এই লিঙ্গ-বৈষম্যের বীজ বপন করা হয়েছে, কারণ আমরা ছোট থেকেই আমাদের পাঠ্য বিষয় থেকে জেনে আসছি যে সমাজে পুরুষ ও নারীকে আলাদা আলাদা ভূমিকা পালন করতে হয়। যেমন— 'ডাক পাড়ে ও ঔ / ভাত আনো বড় বৌ' - সহজপাঠের এই দুই লাইনেই বৈষম্য পরিস্ফুট হয়। এখানে যেন আমাদের এটা বোঝানো হচ্ছে যে ভাত রান্না করা বা খাওয়ানো নারীর কাজ, সেটা পুরুষের নয়। আবার আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' ছোট গল্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে দেখব যে কিভাবে সমাজে স্বামীরা তার স্ত্রীর উপর অধিকার প্রয়োগ করে। এখানে তার কিছু অংশ উদ্বৃত করা হল—'ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়েছিস তোয় হাড় গুঁড়াইয়া দিব। চন্দরা বলিল, তা হইলে তো হাড় জুড়ায়। বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার গৃহবন্দী করিয়া দিল।' স্বামী স্ত্রীর এই সংলাপ থেকে পুরুষের তার স্ত্রীদের প্রতি নির্যাতন এবং তাদের গৃহবন্দী করে রাখার যে স্বয়ং নির্মিত অধিকার তার চরম প্রকাশ ঘটে গল্পের পরবর্তী অংশে যখন ছিদামের দাদা দুখিরাম সন্ধেবেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে তার স্ত্রীকে বলেন - 'ভাত দে' বড় বৌ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মত এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া উঠিল, ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।' স্ত্রীর এই বাক্য শুনে বিশেষ করে স্ত্রীর শেষ কথাটি গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন যেন অসহ্য হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল 'কি বললি'। বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল।

নারীদের প্রতি এই নির্যাতন পুরুষ কর্তৃক আরোপিত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তার এই লেখার উপসংহারে স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে তিনি চন্দরার পক্ষ নিয়েছেন। নারীদের প্রতি এইরূপ আচরণ আমাদের এটা জানায় যে, আমাদের সমাজে নারীরা কত অসহায় অবস্থায় দিন কাটায়। বিশেষত নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি নিয়ে আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও এই অধিকার নারীদের পেতে বহু সময় লাগবে। এক্ষেত্রে নারীদের নিজেদের শক্তিশালী হতে হবে। পরিবারে মেয়েরা যতদিন অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল থাকবে এবং সে সনাতনী মা ও স্ত্রীর ভূমিকা পালন করে যাবে, ততদিন তার ওপর নির্যাতন অবিরত চলতে থাকবে। এখনও বহু দেশে নারীদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় না এবং সব দিক থেকে নারীদের নিচু চোখে দেখা হয়। সেই কারণে তারা পুরুষের তুলনায় বহু সামাজিক উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়। নারীদের সামাজিক উন্নয়নের আন্দোলনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব অনেক কম। তারা সব দিক থেকে এতই দুর্বল যে তারা প্রায় কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সব ব্যাপারেই তাদের পুরুষদের সাহায্য নিতে হয়।

যদিও আমরা বলি যে নারীরা পুরুষের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। কিন্তু আমরা সমাজে অন্য একটি চিত্র দেখতে পাই, যেখানে নারীরা নারী কর্তৃক অত্যাচারিত হচ্ছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের গ্রামবাংলার গৃহবধুরা (নারী) তাদের শাশুড়ি অর্থাৎ নারী কর্তৃক অত্যাচারিত হয়। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে গৃহবধু নির্যাতন এবং হত্যা সংক্রান্ত খবরে তাদের শাশুড়ির সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জাতিভেদ অর্থাৎ স্ত্রী জাতি এবং পুরুষ জাতির - এই পার্থক্য সমাজে বিশিষ্ট মহিলারাও স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন - জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখেছেন : 'মানুষ পৃথিবীতে একটা জাত। তাতে আবার দুভাগ - পুরুষ ও স্ত্রী। কিন্তু তাতে মানুষের সমস্যা মেটেনি, সে স্ত্রী জাতির মধ্যেও দাগ কেটে দুজন করেছে। একজন হল পুরুষের ঘর সংসারের গৃহিনী বা সন্তানের জননী - সেবিকা, তার নামই হল সতী। আর অন্য জন হল তার প্রমোদ বিলাসের সঙ্গিনী, বহুল্লভা, গৃহধর্মহীনা এক নিঃসঙ্গ নারী - তাকে অসতী বলা চলে'[৫] আমরা দেখছি যে মায়েরাই নিজেদেরকে একটি পৃথক জাতি করে নিয়েছে। স্ত্রী জাতি - এই শব্দটির ব্যবহার বিশ শতকেও

বিরল নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো কোন অর্থে কীভাবে মেয়েদের একটা পৃথক জাতি বলে ভাবা হয়? আমরা জানি যে জীব জগতের কোন কোন প্রজাতিতে স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ – এই বিভাগ করা হয়েছে তাদের প্রয়োজনের স্বার্থে, তাহলে কি সেই রকম প্রয়োজনের স্বার্থেই এইরূপ বিভাগ মানুষের মধ্যেও করা হয়েছে?

আমরা প্রায়শই একথা বলি যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা তাদের সঠিক মর্যাদা পাননি, কিন্তু আমরা যে পুরুষতন্ত্রের কথা বলি সেই পুরুষতন্ত্রের প্রবক্তা কোন একটি বিশেষ পুরুষ বা একটি পুরুষ-প্রধান গোষ্ঠী নয়। জগতে প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে দুটি বর্গ আছে – পুরুষ এবং নারী। এই দুই বর্গের স্বভাব পরস্পর থেকে ভিন্ন। পুরুষের যে গুণাবলী সেগুলি প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং যে গুণাবলী পুরুষের মধ্যে বর্তমান নেই তাকে হেয় করা হয়। প্রক্রিয়াটা অনেকটা এইরকম যে প্রতিটি সমাজে পুরুষ ও নারীর কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়। এই ভূমিকাগুলি প্রতিটি সমাজে নিজস্ব সৃজিত ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে সিমন দ্য বোভায়ের (Simone De Beauvoir 1908-1986) বিখ্যাত উক্তি 'One is not byaran, but rather become a women'. (The Second Sex)[৬] নারী ও পুরুষ ছাড়া থাকে একটা আদর্শ মানবের কল্পনা। পুরুষ নারীর পরিচয় লিঙ্গ সাপেক্ষে করা হলেও মানব বা হিউম্যান-এর কল্পনা কিন্তু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বলে দাবি করা হয়। যেমন – কোন সমাজে হয়তো পুরুষের চাকরি আর নারীর সংসার করাটা প্রত্যাশিত ভূমিকা। অপর সমাজে হয়তো প্রত্যাশা করা হয় নারী রোজগার করবে। প্রত্যাশা জাগে সামাজিক কারণে, সমাজে লিঙ্গ-ভেদের দ্বারা পুরুষ ও নারীর ভূমিকায় ভেদ করা হয় বলে। এই পার্থক্য জন্মগত নয়, বরং সমাজের দ্বারা সৃজিত পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত মনঃস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষার কথা বলা যায়। যথা – যখন কোন পুরুষ শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ পুরুষ শিশুটিকে দেখতে আসা তার আত্মীয় সকলেই তার প্রশংসা করে বলে ছেলেটি হৃষ্টপুষ্ট, তার হাসি ও ভঙ্গি দস্যি ছেলের মতো, আবার ঐ একই শিশুকে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে বসানো হলে অন্য একদল আত্মীয় তাকে ছোট্ট মিষ্টিসোনা বলে উল্লেখ করেন। তার হাসি ও ভঙ্গিকে তাঁদের কোমল মধুর মনে হয় ও তাঁরা পুতুল উপহার দেয়। এই নিরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, শিশুরা লিঙ্গ-অনুযায়ী আলাদা কোন আচরণ করে না, আমরাই তাদের আলাদা চোখে দেখি এবং এই অনুযায়ী তার প্রতি আলাদা আচরণ করি। একজনকে দিই বল ও বন্দুক এবং অন্যজনকে দিই পুতুল। লিঙ্গ নির্মাণের ধাঁচ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি পরতে বিন্যস্ত, কারণ আমাদের অবচেতনে ঢুকে গেছে কতকগুলো স্টিরিওটাইপড বিভাজন।

নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে। যেমন করে আমরা মনের মধ্যে কুসংস্কার, পিছিয়ে পড়া ভাবনা চিন্তা দূর করি এবং যুক্তি-বিচার বোধ গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান সচেতনতার ব্যাপারে জোর দিই, ঠিক তেমনি এক্ষেত্রেও আমাদের অতীত কালের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। এটা আমরা আশা করতে পারি যে, সমাজে যত শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে আমাদের এ বিষয়ে অবস্থার উন্নতি ঘটবে। একথা সত্য যে, যে ছেলেটি ছেলেবেলা থেকে মাকে বাইরে বেরিয়ে কাজে যেতে দেখেছে সে বড় হয়ে তার স্ত্রীর বাইরে কাজ করার সমস্যাটা অনেকখানি উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু আমরা আমাদের প্রজন্মে তা উপলব্ধি করতে পারছি না। এক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আমাদের অনেক বেশি মজবুত করবে।

নারীদের প্রতি যে হিংসামূলক আচরণ তা বন্ধ করতে হলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে, কারণ নারীদের প্রতি এই হিংসাত্মক আচরণ করার সুযোগ পুরুষদের সমাজ কর্তৃক প্রাপ্য। অনেক সময় পুরুষ কর্তৃক নারীরা অত্যাচারিত হলেও পুরুষরা শাস্তি পায় না। তাই শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন দিয়ে নারীর প্রতি অত্যাচার বন্ধ করা যাবে না। তবে তার অর্থ এই নয় যে, আইনের কোন প্রয়োজন নেই। বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে আইন প্রণয়ন না হলে হিন্দু ধর্মের সনাতনপন্থীদের সমালোচনা শেষ হবে না। তাই তিনি আইন প্রণয়নের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এটাও মনে করেন যে, নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কেবলমাত্র আইন যথেষ্ট নয়। তাই তিনি বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার মূলক কাজ করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে নতুন শতাব্দীতে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে আমরা ওপরে উঠছি। আজ অনেক নারী বেঁচে থাকার উন্নততর পরিস্থিতি পেয়েছে। রামমোহন যে নারী-পুরুষের মানস ক্ষমতার সমতার উপর আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন, আজ তা প্রমাণিত। অনেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান ভালো ফল করেছে। এসব সত্ত্বেও রামমোহনের পর্যবেক্ষণ আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও সত্য। বিশেষ করে নারীদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের ভয়াবহতা আজও লক্ষ্যণীয়। পার্থক্য এই যে আজ নারীরা নিজেদের আন্দোলন নিজেরা সংগঠিত হয়ে লড়ছে। নারীরা আজ ফিরিয়ে দিতে চায় সেই সব স্মৃতিশাস্ত্র যা নারীদের কেবল অবদমনের কথা বলেছে। তারা মনে করেন সেই সময়ে কোন নারী মুনি থাকলে বিধান হতো অন্যরকম আজ কোন পুরুষের সাহায্য ছাড়াই নারীরাই অর্জন করতে চায় নিজেদের সত্য, কোন পুরুষের স্বর নয়, নারীরা আজ খুঁজছে নিজের স্বর।

উল্লেখপঞ্জী :

১। বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী; (২০০৮), প্রসঙ্গ মনবীবিদ্যা, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১৮৫
২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; (পৌষ, ১৪১০) রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৭৭১
৩। মৈত্র, শেফালী; (২০০৭), নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ২৩
৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; (২০০৩), গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম, কলকাতা, পৃঃ ১৭৩
৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; (২০০৩), গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম, কলকাতা, পৃঃ ১৭০
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; (২০০৩), গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম, কলকাতা, পৃঃ ১৭০
৭। দেবী, জ্যোতির্ময়ী; (১৯৯২), সমাজে একটি অন্ধকার দিক, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, প্রথম খন্ড, যাদবপুর নারী শিক্ষাকেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ৩৬৯
৮। মৈত্র, শেফালী; (২০০৭), নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৮৮

সূত্র নির্দেশ :

১। তর্করত্ন, পঞ্চানন অনুদিত ও সম্পাদিত; (১৯৯৩), মনুস্মৃতি, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।